ড. কেতকী কুশারী ডাইসন

বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক

প্রথমে 'পরদেশে পরবাসী'[১]র গঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলে নিতে চাই। শ্রেণীর বিচারে বইটিকে চিহ্নিত করা যায় আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথার ভিত্তির উপরে দাঁড়-করানো উপন্যাস। তবে কেবল সেইটা বললে সবটা কিন্তু বলা হয় না, কেননা এই বইয়ের মধ্যে সত্যিই লক্ষ্য করবার মতো উপাদানবৈচিত্র্য রয়েছে। আমি যতদূর বুঝেছি, আবদুর রউফ তাঁর প্রথম পর্বের বিলেতবাসকালে ডায়েরির মাধ্যমে তাঁর অভিজ্ঞতাগুলিকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতেন। পরবর্তীকালে সেই মালমশার সাহায্যেই তিনি উপন্যাস খাড়া করেন। তাঁর নিজেরই জবানবন্দি অনুসারে, 'বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগে সত্যের আলোছায়ায় ব'সে রচিত এই উপন্যাস।' এখানে আছে কিছু উপাদান যা স্পষ্টতঃ তাঁর ষাটের দশকের দিনলিপির নথিপত্র থেকে নেওয়া; তার সঙ্গে অনিবার্যতঃ মিশেছে উপন্যাসকারের কল্পনা; এ ছাড়া লেখক জুড়েছেন বেশ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনা। এই সংমিশ্রণ আমাদের সময়ের স্বভাব দ্বারা চিহ্নিত। বিচিত্র উপাদানে উপন্যাস নির্মাণ আমাদের যুগধর্ম। ডকু-নভেল বা দলিলধর্মী উপন্যাস একটি স্বীকৃত সাহিত্যশাখা। এই ব্যাপারটিতে তাঁর সঙ্গে আমি আত্মীয়তা অনুভব করি, কারণ আমিও নানান উপাদানের সংমিশ্রণে উপন্যাস আর নাটক গড়তে ভালোবাসি।

এখানে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ব'লে নেওয়া যায়। বিচিত্র উপাদান মিশিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষামূলক আঙ্গিকে শিল্পের নবকলেবর নির্মাণ সকলের রুচিসম্মত হয় না। কেউ কেউ চান, উপন্যাসে একটা টানা গল্প থাকবে, তা ছাড়া বড় জোর একটা গৌণ প্লট থাকতে পারে; তেমনি নাটকেও একটা পরিষ্কার কাহিনী থাকবে, একটা প্লট, হয়তো একটা সাবপ্লট। উপন্যাস-নাটক উভয় শাখাতেই এঁরা চান সে ঘটনা বা অ্যাক্শনের ধাপে ধাপে– কিছু মোড় নিয়ে, কিছু বাঁক ফিরে– কাহিনী একটা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সমবেত বিদগ্ধমণ্ডলীকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, আমাদের যাপত জীবনের ডৌল কদাচিৎ ওরকম সুস্পষ্ট, নিটোল ও দৃঢ়রেখা হয়। জীবন আর লিল্পের মধ্যে ব্যবধান বেশী হলে কারও কারও পক্ষে তা পীড়াদায়ক হয়। আবার কেউ কেউ সেই ফারাকটুকু থেকেই আমোদ সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব। কেউ কেউ শিল্পকর্মের কাছ থেকে এক জাতের সহজ বিনোদন প্রত্যাশা করেন। অথচ সেই সহজ প্রত্যাশা থেকে বেশ কিছু দূরেই বহু আধুনিক শিল্পিত কর্মের অবস্থান।

একটু গভীরে যাওয়া যাক। 'স্ট্রীম অফ কন্শাস্নেস' বা 'চেতনাপ্রবাহ'-নামক আঙ্গিকের মাধ্যমে উপন্যাসের মধ্যে রাজ্যির জিনিস ঢোকানো বিশ শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই রাজ্যির জিনিস ঢোকানোর ব্যাপারে গদ্যলিখিয়েরা মূলতঃ অনুপ্রাণিত হয়েছেন এপিক অর্থাৎ মহাকাব্য বা দীর্ঘকাব্য দ্বারা। একবার ভাবুন, মহাভারতে কী না নেই। ইতিহাস, পৌরাণিক কল্পনা, রাজনীতি, ধর্মোপদেশ– সবই সেখানে আছে। হয়তো সংকট ঘনিয়ে আসছে, তবুও সমেয়ের স্রোতস্বিনীকে থামিয়ে দিয়ে কোনো মুনি হয়তো হাঁটু মড়ে ব'সে পড়লেন পূর্বজন্মের কাহিনী বলতে বা জ্ঞান বিলি করতে। অনেক ন্যারেটিভেই থেকে থেকে উজানে যাবার একটা প্রয়োজন থাকের বটে। সেই তাগিদ থেকেই সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকটা তৈরি হয়েছে। আর নাটকের তেমনি একজন চিন্তাশীল নাট্যকার চান মধ্যে মধ্যে সময়ের স্রোতকে থামিয়ে দিয়ে অন্য এক ধরনের মুহূর্তমালাকে নির্মাণ করতে, যেখানে থাকবে পিছনে তাকানো,

[১] পরদেশে পরবাসী, আবদুর রউফ চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৩।

বা ভবিষ্যতের দিকে তাকানো, বা কাব্য, বা দার্শনিক অনুভব, বা প্রগাঢ় সোক্রাতিক সংলাপের মাধ্যমে জীবনের কিছু জরুরী প্রশ্নের অন্বেষণ। কিছু সমালোচক বা দর্শক এরকম সময়ে হয়তো ব'লে ওঠেন, 'উফ্, আবার কাব্যি হচ্ছে,' বা 'আবার লেক্চার আরম্ভ হলো।' যাঁরা এ ব্যাপারে অসহিষ্ণু, আবদুর রউফের উপন্যাসটি তাঁদের মনপূত নাও হতে পারে। কেননা তিনি মাঝে মাঝেই গল্প বলা থামিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, উজান বেয়ে অতীতে চ'লে যান, কিংবা ভাবনামূলক অংশের অবতারণা করেন, পাঠককে ভাবাতে চান, অর্থাৎ অসহিষ্ণু সমালোচকদের ভাষায়, 'লেক্চার ঝেড়ে দেন'। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মন কেড়েছে, কেননা আমি নিজে একটি উপন্যাস, নাটক বা দীর্ঘকবিতার নিছক গল্পের দিকটার চাইতে লেখকের চিন্তাভাবনার দিকটা সম্বন্ধেই অধিক আগ্রহ বোধ করি। আলোচ্য উপন্যাসে আবদুর রউফ চিন্তার যে-জগৎটি নির্মাণ করেছেন, তা আমাদের মনোযোগ দাবি করে। তাঁর চিন্তাশীল লেখকসত্তাটি এই বইয়ে পরিস্ফুট।

ইতিহাস, সমাজ, স্বদেশ, বিদেশ, রাজনীতি, ধর্ম, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক– নানা বিষয়েই তাঁর চিন্তার প্রতিফলন এই বইয়ে পাওয়া যায়, তবে তাঁর কোনো ডগমা নেই, কোনো একপেশে মনোভাব নেই। আমার মনে হয়েছে যে স্বভাষার সাধারণ পাঠককে শিক্ষিত ক'রে তোলার একটা তাগিদ তিনি গভীরভাবেই অনুভব করেছেন, তাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। উপন্যাসকে তিনি নিছক বিনোদন হিসেবে দ্যাখেন না। শিক্ষাদানকে তার একটা অঙ্গ ব'লেই মনে করেন। এই অবস্থানের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই, কারণ আমি সাহিত্যে বৌদ্ধিকতার সঞ্চারণ দেখতে ভালোবাসি। তবে সাহিত্যে শিক্ষাদানের স্থানটি কোথায় সেই প্রশ্নটি নিয়ে তর্ক হতেই পারে। কেউ কেউ এই ব্যাপারটি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। এঁদের মতে এতে রসভঙ্গ হয়। বলা যেতে পারে, আবদুর রউফ যদি মূলধারার সাহিত্যনবিশির মাধ্যমে লেখালেখির জগতে আসতেন, তা হলে হয়তো তাঁর লেখার এই শিক্ষামূলক দিকটাকে আরেকটু তির্যক ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন, এবং হয়তো সে-পথে তাঁর উপন্যাসটি আরেকটু অন্যভাবে প্রকাশ লাভ করতো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি নিজে তো সাহিত্যের অনুশীলিত পথেই সাহিত্যরচনাতে এসেছি, তির্যক রীতিতে হাতে-খড়ি হয়নি এমন নয়, তৎসত্ত্বেও সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে বৌদ্ধিকতার প্রকাশের জন্য আমাকেও মধ্যে মধ্যে কড়া সমালোচনা শুনতে হয়। এদিকে আবদুর রউফ স্পষ্টতঃ একজন সংগ্রামী মানুষের জীবন যাপন করেছেন এবং স্বদেশে তথা এ দেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গ'ড়ে-পিটে নিজেকে লেখকরূপে নিমার্ণ করেছেন। আমার মতে, তাঁর মতো একজন স্বনির্মিত কথাসাহিত্যিকের বেলায় এ ধরনের বাছবিচার পাশে সরিয়ে রাখা যেতে পারে; তাঁর উপন্যাসের বৌদ্ধিকতার চর্চা আর শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাকে প্রশংসাই করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলবো। আমি একটি চিন্তাবিনিময়চক্রের সভ্য, যার মধ্যে আছেন কয়েকজন বিজ্ঞানীও। তাঁদের মধ্যে একজন একাধারে মাইক্রোবায়লজির অধ্যাপক এবং সৃষ্টিশীল চিত্রশিল্পী। তিনি তাঁর সব ছবিতে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেন, কিছু একটা দেখাতে চেষ্টা করেন। ছবির পাশে পাশে ভাষ্য লিখে দেন। তিনি একটি উপন্যাসও লিখেছেন, এবং সেখানেও সংলাপের এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবন সম্বন্ধে কিছু জরুরী বক্তব্য সরবরাহ করতে চেয়েছেন। আবদুর রউফের মতো তিনিও তাঁর শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যটি গোপন করার চেষ্টা করেন নি। বলতে চাইছি যে, যাঁরা তথাকথিত পেশাদার শিল্পী নন, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির জগৎ থেকে শিল্পের জগতে এসেছেন, শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানে বিশ্বাস করতে তাঁদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না, পেশাদার সাহিত্যসমালোচক বা সাহিত্যের অধ্যাপকদের চাইতে অনেক কম অসুবিধা হয়। তাঁরা বরং উল্টে প্রশ্ন করেন, জিনিসটা কেন টাবু হবে,

এতে কেন রসভঙ্গ হবে, কেন এতে আমাদের অধিকার নেই? আমি ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময় করেছি ব'লেই আমার মনে হয়, আবদুর রউফ এই দলে পড়েন।

'পরদেশে পরবাসী' বইটির অন্য যে-দিকটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেটি তার ডকুমেন্টারি-দিক। আবদুর রউফ ১৯৬২ সালের ১০ই জানুয়ারিতে বিলেতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, আর তাঁর গল্পের নায়কও ঐ তারিখেই লন্ডন পৌঁছচ্ছেন। আমি নিজে প্রথম বিলেত এসেছিলাম ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে এই দেশটা কেমন ছিলো, সেটা আমার নিজের জানা ব'লেই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি একটা বিশেষ কৌতূহল অনুভব করেছি। সেই সময়কার বাস্তবতাকে আবদুর রউফ চমৎকারভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং বইটি পড়তে পড়তে আমি অনেকবারই মনে মনে এই দেশের পুরোনো চেহারাটায় ফিরে গেছি। পুরোনো চেহারা বলতে যা বোঝাচ্ছি তার মধ্যে সামাজিক দিক আছে, প্রাকৃতিক দিকও আছে। সমাজ তো বদলাবেই, কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর দৌলতে প্রকৃতির রূপও যে একটু একটু ক'রে বদলে যাচ্ছে তা আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি। এখানে উল্লেখ করতেই হয় বাষট্টি-তেষট্টি সালের শীতকালের কথা। অমন কঠিন শীত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিলেতে আর কখনো পড়ে নি। দিনের পর দিন দুনিয়ার ওরকম তুষারীভূত শ্বেতমূর্তি আমাদের সন্তানদের প্রজন্ম কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। ইংল্যাণ্ড তো নয়, যেন রাশিয়া। আমরা যারা সেই শীতকালটা স্বচক্ষে দেখেছি তারা কোনোদিনই তার কথা ভুলতে পারবো না। আমার নিজের একটি কবিতাতেও তার পরিষ্কার স্বাক্ষর রয়েছে। আবদুর রউফ ঐ একই শীতকালের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন এই বইটিতে।

এই উপন্যাসে আবদুর রউফ ষাটের দশকের বিলেতপ্রবাসী সিলেটীদের দৈনন্দিন জীবনের যে-ছবি এঁকেছেন, সামাজিক দলিল হিসেবে তার মূল অনস্বীকার্য। এই জীবনের সংগ্রাম, তার আশা-নিরাশা, ফেলে-আসা জীবনের জন্য স্মৃতিবিধুরতা, নানা সমস্যার মোকাবিলায় প্রতিকারের চেষ্টা– সবই খুঁটিনাটিসমেত ফুটে উঠেছে। জীবনের এই বৃত্তে রেষারেষি, ঈর্ষা, দলাদলি, রাজনীতি যেমন ছিলো, তেমন বিপদে-আপদে পরস্পরকে মদত দেওয়া এবং অতিথিবৎসলতাও ছিলো। ছিলো জীবিকার জন্য প্রবল আর্তি, দুর্দান্ত শীতের সঙ্গে লড়াই, পুরুষের জীবনে নারীর অভাব, গাদাগাদি ক'রে থাকা মেসের পরিবেশে ব্যক্তির জন্য প্রাইভেসির অভাব, সিলেটী বাড়িওয়ালাদের দাপট। এঁরা এক-একটা বাড়ি কিনে একসঙ্গে অনেকজন দেশী ভাইকে ভাড়া দিতেন, তাই তাঁরা খুব ক্ষমতাবান হতেন। 'ল্যাণ্ডলর্ড' শব্দের অপভ্রংশে এঁদের বলা হতো 'লেণ্ডলুট'। এই ব্যবস্থায় নবাগত সিলেটীরা একদিকে উপকৃত হতেন, আবার অন্যদিকে শোষিতও হতেন। প্রবাসী মানুষগুলি সব অসুবিধে পুষিয়ে নিতেন পরস্পরের প্রতি প্রীতিসিক্ত আতিথ্য দিয়ে। কেউ অনেক রাতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কারও বাড়িতে পৌঁছলেও উষ্ণ আপ্যায়ন পেতেন।

ষাটের দশকে আমি নিজে অবশ্য অক্সফোর্ডে ছাত্রীর জীবন যাপন করেছি। সেই জীবনে অন্য একটা ছাঁচ ছিলো। মূলতঃ পড়াশোনার জীবন, বলা যায় প্রিভিলেজের জীবন। ইংরেজ সহপাঠিনীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিলো; সেই সূত্রে ইংরেজ সমাজের সঙ্গে বিনিময়ের পথ প্রশস্ততর ছিলো। কিন্তু অক্সফোর্ডে টার্ম ছিলো মাত্র বছরে চব্বিশ সপ্তাহ। বাকি সময়ে দিশি ছেলেমেয়েরা যে-যার বাড়ি চ'লে যেতো, আর বিদেশীদের একাই থাকতে হতো। পরবর্তী কালের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর-সমেত তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত কিছু মানুষ আমার বন্ধুসংগ্রহের মধ্যে ছিলেন। তাঁদের অতিথিবৎসলতার স্মৃতি আজও আমার মধ্যে অমলিন। আমার জন্য তাঁদের দরজা সব সময়েই খোলা থাকতো, এবং একবার ডিনার খেয়ে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছলেও প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বসতে হতো কিছু-না-কিছু মুখে দেবার জন্য। রসিকতা ক'রে তাঁরা বলতেন, 'পড়েছো যবনের হাতে, খানা

খেতে হবে সাথে।' এইরকম একটি বন্ধুদম্পতি পূর্ব-অক্সফোর্ডে সিলেটী বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ভাড়া-নেওয়া ছোট্ট বাড়িতে থাকতেন। সে-বাড়িতে বাথরুম ছিলো না, তাঁরা পাবলিক বাথে স্নান করতে যেতেন, আমাকে তার গল্প বলতেন। তাই আবদুর রউফের উপন্যাসটিতে পাবলিক বাথে স্নান করার বিশদ বর্ণনা যখন পড়লাম, ঘটনাটা সহজেই ছুঁতে পারলাম। এ ছাড়া সে-আমলের অক্সফোর্ডে সিলেটীদের দ্বারা পরিচালিত রেস্তোরাঁও কয়েকটি ছিলো, এবং মশলা দেওয়া খাবারের জন্য যাদের প্রাণ আনচান করতো তাদের জন্য সেগুলি ছিলো যাকে বলে 'লাইফ-লাইন'। স্বদেশীদের দ্বারা পরিচালিত রেস্তোরাঁ ছাড়াও সিলেটীরা কখনও কখনও অন্যদের দ্বারা পরিচালিত রেস্তোরাঁতেও কাজ করতেন। যেমন, একজন সিলেটীকে চিনতাম, যিনি ছিলেন একটি সিপ্রিয়ট-পরিচালিত রেস্তোরাঁর শেফ্। আমরা তাঁকে 'মিয়াঁ সাহেব' ব'লে ডাকতাম। আমাকে তিনি অশেষ খাতির করতেন, ব'লে দিতেন কোন্ পদটা টাটকা– সদ্য তৈরি করা হয়েছে, কোন্টা বা বাসি, এবং প্লেট উপচে খাবার পরিবেশন করতেন। আমার প্রথম উপন্যাস 'নোটন নোটন পায়রাগুলি'-তে এই মিয়াঁ সাহেবের ভিত্তিতে রচিত একটি চরিত্রের ছোট্ট ক্যামিও-জাতের স্কেচ আছে। বলতে চাইছি যে ষাটের দশকে আমরা নিজের অবস্থান সিলেটী ভাগ্যান্বেষীদের থেকে দূরে হলেও একেবারে সুদূর ছিলো না। তাঁদের জীবনকে আমি ছুঁতে পারতাম, তাই আবদুর রউফের উপন্যাসে ব্যবহৃত অনেক ডিটেলই আমার কাছে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে সুপরিচিত, যা আমার এই বইটি পড়ার আনন্দকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ আনন্দ হচ্ছে চিনতে পারার আনন্দ। এমন কি, আবদুর রউফ যখন লেখেন, 'মেয়ে বাগানো মুসলমানের একটা বিশেষ গুণ,' তখন মনে প'ড়ে যায় যে সেকালে এ ধরনের রসিকতাও আমার পূর্বপাকিস্তানী বন্ধুদের মুখে শুনেছি। এ ছাড়া বইয়ে সাদা-কালো বর্ণনির্বিশেষে পুনরাবৃত্ত চিন্তাহীন অবারিত ধূমপানের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাকেও সে-যুগের বাস্তবতা ব'লে চিনতে পারি। তবে এই বইয়ের মাধ্যমে কিছু নতুন তথ্যও জেনেছি। যেসব পাঞ্জাবি ছেলেরা পথে ভাসমান দেহবিক্রয়কারিণীদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতো তাদের 'মৌআলু' বলা হতো, পুলিশ কিছু বলতে এলেই ঐ মেয়েরা দাবি করতো যে তারা ঐ ছেলেগুলির সম্পূর্ণ বৈধ বান্ধবী, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ রুখতে না পেরে পুলিশ উত্ত্যক্ত বোধ করতো, এবং সেই বিরক্তির সূত্রেই ক্রমে ক্রমে 'পাকি'–নামক গালাগালির উৎপত্তি– এই খবরটি আমার জানা ছিলো না। আমি প্রথম যখন এ দেশে এসেছি তখন এই গালিটি উদ্ভাবিত হয় নি। তার পর কোনো এক সময়ে দেখি এটা চালু হয়েছে। 'পরদেশে পরবাসী' বইটি এ ব্যাপারে আলোকপাত করে।

উল্লেখ করা দরকার, এই উপন্যাসে মানুষের যৌনতাকে ঘিরে যেসব সমস্যা তাদের উপরে একটা ঝোঁক পড়েছে। নারীবর্জিত প্রবাসী পুরুষের জীবনে যৌনতার ক্ষুধা একটা দাবিদার চেহারা নিয়েই আসে– সম্ভবতঃ সেই কারণেই এই ঝোঁক। উপন্যাসের পরিবেশে ইংরেজদের সঙ্গে পরবাসী পুরুষদের সামাজিক মেলামেশা সীমাবদ্ধ, সমকক্ষ বন্ধুত্ব একটি বিরল ঘটনা। আদানপ্রদান ঘটে মুখ্যতঃ দুটি চ্যানেলে– চাকরির সূত্রে এবং যৌনতার প্রয়োজনে। তবে যৌনতার তাগিদে বিনিময় আরম্ভ হলেও সহমর্মী বন্ধুত্ব যে গ'ড়ে উঠতেই পারে, তার একটা আবাস দেওয়া হয়েছে ফারনিন-নামক রহস্যময়ীর মাধ্যমে। এ ছাড়া আরও লক্ষণীয় যে কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপ মিয়ার মধ্যে প্রাচীন আর নবীনের একটা সংমিশ্রণ আছে। নারীদের দেহপ্রদর্শন বা পাঠানদের সমকামিতার প্রতি রূপ মিয়া কিছুটা বিরূপ, তা বুঝতে পারা যায়, আবার একইসঙ্গে মীনা-নামক মেয়েটির সন্তান যে খুব সম্ভব তার স্বামী মজিদের ঔরসে নয় তা বুঝেও রূপ মিয়া মীনার কোনো কড়া সমালোচনা করতে চায় না। মজিদের দেশে ফেরার ছ'মাস সতেরো দিন পরে মীনার সন্তান জন্মেছে। রূপ মিয়া ব্যাপারটি গুরুত্ব দেয় না। সে একাধারে বাস্তববাদী এবং আধুনিকমনস্ক। সে জানে যে এমন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানটি মেনে নেওয়ার মধ্যেই সকলের কল্যাণ নিহিত। প্রোষিতভর্তৃকা নারী মীনার মধ্যেও প্রত্যাশিত কারণেই যৌন ক্ষুধা এবং প্রীতিস্পর্শের জন্য তৃষ্ণা ছিলো, সম্ভবতঃ সেই

দাবি মেটাতে গিয়েই সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছে। কিন্তু রূপ মিয়া সেজন্যে তাকে কলঙ্কিনী বলতে নারাজ, তাকে দণ্ড দিতে নারাজ। উদ্ভ্রান্ত মজিদকে সে উপদেশ দেয়, 'বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকো।' রূপ মিয়ার মধ্যে যেহেতু উপন্যাসকারের আত্ম-অভিক্ষেপ অনেক, তাই আমরা অনুমান করতে পারি যে স্বয়ং আবদুর রউফ এ ব্যাপারে প্রাজ্ঞ ছিলেন, এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মধ্যে সেই প্রজ্ঞার ছায়া পড়েছে। পুরুষ তার প্রয়োজন মতো নারীসংসর্গ করবে, অথচ স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা নারী দিনের পর দিন ব্রহ্মচর্য পালন করবে, এ জাতের কঠোর পিতৃতন্ত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বস্তুতঃ বোঝা যায় যে তিনি স্ত্রীপুরুষের সাম্যে আস্থাশীল ছিলেন। রূপ মিয়া এক জায়গায় পরিষ্কার বলে, 'অবরোধ প্রথাই মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ; নারী যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে সর্বক্ষেত্রে– এ সত্যবোধ হরণ করেছে এ কুপ্রথা, যার কুফলে মুসলমান সমাজ আজ পঙ্গুত্বে পরিণত হয়ে সকল দ্বারের ভিখারি হয়েছে।'

আরও একটি ইশ্যুতে এই বইটির একটি বিশেষ মূল্য থাকা উচিত ব'লে মনে করি। সেটি হলো ভাষাসংক্রান্ত আত্ম-পরিচয়ের ইশ্যু। আবদুর রউফ তাঁর কাহিনীর ন্যারেশনে সাহিত্যিক বাংলা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সিলেটীদের মুখের ভাষাকে অবহেলা করেন নি। সংলাপে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহারের চূড়ন্ত পরিণতি ঘটেছে উপন্যাসের শেষে তসলিম আলির স্মৃতিচারণে। ভারী প্রাণবন্ত এই ভাষা। একটু উদাহরণ না দিয়ে থাকতে পারছি না। 'আমগাছর তলাত জিরাইবার লাগি বইলাম। পরে আস্তে আস্তে খাড়ইলাম। বাইংগন গাছর কাটায় গুতা লাগল। আন্দাইরও বাইংগন গাছ দেখা যায় না। পাখির সাড়াশব্দ নাই। মন ডর। হুনছি পেশাবখানায় পেত্নী তাকে। পেত্নীর বদলা পরীও ত অইত পারে। মনে মনে কইলাম, 'লক্ষ্মী যদি প্রাণে বাঁচায়'। আম পাতা চুয়াইয়া মেঘর জল ফোটা ফোটা অইয়া পরতে লাগল আমার মাথার উপরে। মাথাটারে গামছা দিয়া বানলাম। কয়েক মিনিটে গামছা ভিজ্জা কালা গেঞ্জিটা জুইব্বা চামড়াত গিয়া লাগল।' ...ইত্যাদি। এই মুখের ভাষার মাধ্যমে হঠাৎ ইল্যাণ্ডের মঞ্চে সিলেটের গ্রামাঞ্চল মূর্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ভাষা আর গ্রামীণ মানুষের কথ্য ভাষার এই মেলবন্ধনের মধ্যে আজকের দিনের বাঙালীর জন্যে কিছু বার্তা আছে। এই বইয়ে ব্যক্ত গ্রন্থকারের সব মতামতের সঙ্গে আমি একমত এমন কথা বলছি না,– কিছু ক্ষেত্রে তর্ক তোলাই যায়,– কিন্তু সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আবদুর রউফ সমন্বয়ের সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামী অনুষঙ্গে প্রয়োজনমতো আরবী-ফার্সী শব্দ তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেন, আবার এইমাত্রই আমরা দেখলাম, রাতের অন্ধকারে পেত্নীর ভয়ে ভীত তাঁর চরিত্র তসলিম আলি অবলীলাক্রমে ব'লে ওঠে, 'লক্ষ্মী যদি প্রাণে বাঁচায়'। দুই বাংলা মিলিয়ে এই মিশ্রতাই বাঙালী সংস্কৃতির প্রাণ।

এই ভাষা প্রসঙ্গে যোগ করি, পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলনকে আমরা সঙ্গত কারণেই সম্মান জানাই, এ বইয়ে আবদুর রউফও জানিয়েছে, কিন্তু বিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরাও যে বাংলার জন্য লড়েছেন সেই কথাটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ হয়তো তাঁদের দিতে হয় নি, কারণ ভাষার প্রশ্নে সেরকম কোনো বলাৎকার তাঁদের উপরে করা হয় নি যার জন্য রক্ত ঝরাতে হবে, কিন্তু মাতৃভাষার গুরুত্ব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিকদের চেতনা খুবই প্রখর ছিলো। অভিবাসী জীবনেও যে বাংলার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা সম্ভব, আমার নিজের ধারণা তৈরি হলো কোত্থেকে? আমার প্রাপ্তবয়স্ক ধ্যানধারণার বনিয়াদ তৈরি হয় পঞ্চাশের দশকের কলকাতায়। মাতৃভাষায় লেখার প্রতি আমার নিজের যে-দায়বদ্ধতার বোধ, তা লালিত হয় ঐ পঞ্চাশের দশকের কলকাতাতেই। এ ব্যাপারে আমি ঋণী বুদ্ধদেব বসু, তাঁর 'কবিতা' পত্রিকা, এবং তাঁর প্রজন্মের সাহিত্যিকদের কাছে। সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদের সূত্রে আমি তাঁর একটি প্রবন্ধও অনুবাদ করেছি, যেটির শিরোনাম হচ্ছে 'ভাষা, কবিতা

ও মনুষ্যত্ব' । প্রবন্ধটি যখন ১৯৫৭ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম বেরোয় তখনই আমাদের আলোড়িত করে । এটি হচ্ছে তদানীন্তন সরকারী ভাষা-কমিশনের বিবৃতির বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ । কেন্দ্র থেকে হিন্দী চাপিয়ে দেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ করেছেন তিনি, এবং সাহিত্যের বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মান । অথচ মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্য নিয়ে যখন কথা হয়, কই তাঁর নাম তো উচ্চারিত হতে শুনি না । প্রাথনা করি আগামী দিনে আমরা যেন দুই বাংলার মাতৃভাষাপ্রেমিকদেরই অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা জানাতে পারি ।

দুই বাংলার বাঙালীর দল আজ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন এক বিশাল ডায়াস্পোরায়, এবং এই বিকীর্ণ বাঙালীদের মধ্যে থেকে লেখকলেখিকারা বেরিয়ে আসছেন স্বাভাবিক নিয়মেই । 'পরদেশে পরবাসী' বইটি পড়তে পড়তে কয়েকবারই আমার মনে হয়েছে, আবদুর রউফ যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতে কত মজা হতো! কারণ যেখানে তিনি আর আমি দুজনেই বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক, সেখানে আমরা সহপথিক । এই নিরলস সহকর্মীর জন্য রইলো আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য ।